শিল্পায়নের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ এ ভাবে হেরে গেল কেন?

অন্যেরা যখন দৌড়চ্ছে, আমরা বসে পড়লাম

লিখেছেন **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; **অশোকসঞ্জয় গুহ**, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; **কৌশিক বসু**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**, বস্টন ইউনিভার্সিটি; **দেবরাজ রায়**, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি; **প্রণব বর্ধন**, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; **মুকুল মজুমদার**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **মৃণাল দত্তচৌধুরী**, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স এবং **মৈত্রীশ ঘটক**, শিকাগো ইউনিভার্সিটি। আজ প্রথম কিস্তি।

হয়তো এক দিন আমরা জানতে পারব, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের হাল ঠিক কোন সময় কী ভাবে খারাপ হতে শুরু করেছিল। হয়তো এক দিন সেই অধোগমনের সম্পূর্ণ ছবিটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। এখন যে সব তথ্য আমাদের হাতে আছে তার ভিত্তিতে পুরো গল্পটা বলা সম্ভব নয়। যতটা জানা যায়, তার ভিত্তিতেই আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

এটা ঠিক যে, বাজার অর্থনীতিতে উত্থানপতন ঘটেই থাকে; প্রযুক্তি বদলায়, চাহিদার প্রকৃতি বদলায়, শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল জীর্ণ হয়ে পড়ে, নতুন এলাকায় সমৃদ্ধি আসে; ম্যাঞ্চেস্টার বা পিটসবার্গের দ্যুতি ম্লান হয়ে যায়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সিলিকন ভ্যালি। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তবুও মানতেই হবে, সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থান গত কুড়ি বছরে যে ভাবে বদলেছে তাতে রীতিমতো স্তম্ভিত হতে হয়। কিছু সামগ্রিক হিসাব দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যেমন, ১৯৮০-৮১ সালে সারা ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের ৯.৮ শতাংশ উৎপন্ন হত পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৯৭-৯৮ সালে সেই অনুপাত নেমে এসেছে ৫.১ শতাংশে। (আমাদের কাছে ১৯৯৭-৯৮ অবধিই পরিসংখ্যান আছে।) এই অনুপাত অবশ্য সবচেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে, ৪.৭ শতাংশে, পরের দু'বছরে হাল কিছুটা ফিরেছে।

আর একটি সূচক হল, সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান। সেখানেও ছবিটা উদ্বেগজনক। বস্তুত ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭—এই সময়পর্বে সংগঠিত শিল্পে কর্মরত মানুষের সংখ্যাই কমে গেছে; বিশেষত সংগঠিত বেসরকারি শিল্পে ১৯৮০ সালে কাজ করতেন মোট ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার কর্মী, ১৯৯৭ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৯৯ হাজারে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যানেও একই গল্প। ১৯৮৫-৮৬ সালে কলকাতা বন্দর এবং বিমানবন্দর দিয়ে সারা দেশের মোট আমদানি এবং রফতানির প্রায় ১০ শতাংশ চলাচল করত, ১৯৯৮-৯৯ সালে অনুপাতটি দাঁড়ায় মোটামুটি ৪ শতাংশ।

আবার ব্যবসাবাণিজ্য কতটা জোরদার সেটা বোঝার জন্য অন্য একটা পরিসংখ্যান বিচার করা যায়। ১৯৮০-৮১ সালে মুম্বইয়ে যত টাকার চেক ভাঙানো (ক্লিয়ারেন্স) হত, কলকাতায় হত তার ৩৮ শতাংশ, অর্থাৎ মুম্বইয়ে ১০০ টাকার চেক ভাঙানো হলে কলকাতায় হত ৩৮ টাকা; ১৯৯৯-২০০০ সালে অনুপাতটা নেমে এসেছে ৬ শতাংশে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝিও শিল্পায়নের মাপকাঠিতে ভারতের বড় রাজ্যগুলোর তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল দ্বিতীয় স্থানে, ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে এই রাজ্য নেমে এসেছে তালিকার বেশ নীচের দিকে, মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পের অনুপাত বিচার করলে কর্নাটকের পিছনে, উত্তরপ্রদেশের সামান্য উপরে।

একটা কারণে এই পরিসংখ্যান আরও বেশি চমকপ্রদ মনে হয়। শিল্পের এই অবনতি ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন—উত্তাল ষাট এবং নির্মম সত্তরের দশকের পরে—পশ্চিমবঙ্গে অনেকটাই শান্তি ফিরে এসেছে, এসেছে রাজনৈতিক স্থিরতা। 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' রিপোর্ট (১৯৯৭) অনুসারে, ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় সংঘটিত যাবতীয় অপরাধের বিচারে ভারতের ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩০ নম্বরে। এবং ২৩টি বড় শহরের তালিকায় কলকাতার স্থান ছিল ২৩ তম! (নাগরিক এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে।) তা ছাড়া এই সময়ে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন ও কৃষিজাত আয় বেড়েছে, ফলে জিনিসপত্রের চাহিদাও বেড়েছে; আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস ডি পি) বেড়েছে বছরে গড়ে ২.৬ শতাংশ হারে, আর নব্বইয়ের দশকে বৃদ্ধির হার তো রীতিমতো প্রশংসনীয়—বার্ষিক ৫ শতাংশ।

সবচেয়ে বড় কথা, এ সবই ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন গোটা দেশে শিল্পোন্নয়নের সামগ্রিক হার আগের তুলনায় বেড়েছে; ষাট-সত্তরের দশকগুলিতে ভারতে শিল্পোন্নয়নের গড়পড়তা হার ছিল বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ, আশির দশকে সে হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭ শতাংশ, নব্বইয়ের দশকে—সামান্য কমলেও—৬.৭ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, এই সময়েই দেশে উদার আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, এই সময়েই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে দারুণ উন্নতি ঘটেছে, আর তার সুযোগ নিয়ে কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ বা দিল্লির মতো রাজ্য ভারতের শিল্প-মানচিত্রে জায়গা দখল করেছে। মনে হতে পারে, অন্য সবাই যখন উন্নয়নের গাড়িতে উঠে পড়তে তৎপর, তখন পশ্চিমবঙ্গ সাধ করে সেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের এই অধোগমন কেন ঘটল, তার নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সবচেয়ে চালু গল্পটা হল—পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরাই তার শিল্পবাণিজ্যের সংকটের মূলে। বলা হয়েই থাকে—মহারাষ্ট্রে বা গুজরাতে শ্রমিকরা কত সংযত, সে সব জায়গায় লগ্নি না করে বিনিয়োগকারীরা পশ্চিমবঙ্গে আসবেন কোন দুঃখে? শ্রমবিরোধের পরিসংখ্যান দেখলে কিন্তু এই গল্পটা মেলানো শক্ত। হ্যাঁ, আশির দশকের গোড়ার দিকে সত্যি সত্যিই বেশ কিছু ধর্মঘট হয়েছিল। যেমন পশ্চিমবঙ্গের শ্রম কমিশনারের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮০

এর পর চারের পাতায়

বসে পড়লাম

প্রথম পাতার পর

সালে ৭৮টি ধর্মঘট হয়। কিন্তু আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘটের মাত্রা কমে আসে, নব্বইয়ের দশকেও সে ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ সালে বছরে গড়ে ২২টি ধর্মঘট হয়—১৯৮০ সালের উল্লিখিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলেই পরিবর্তনটা বোঝা যাবে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭, এই আট বছরে ধর্মঘটের জন্য প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৭ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৯২ সালেই কেবল একটি সত্যিকারের বড় ধর্মঘট হয়, এবং ওই বছরটিকে বাদ দিলে শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার গড় অঙ্কটা নেমে আসে ৬ লক্ষে। অন্য ভাবে বললে, সংগঠিত বেসরকারি শিল্পে যত কর্মী নিযুক্ত, তাঁদের মাথাপিছু বছরে এক দিন ধর্মঘটের জন্য নষ্ট হয়েছে। আবার বিভিন্ন বছরের শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার পরিসংখ্যানগুলিকে যদি কম থেকে বেশি (বা বেশি থেকে কম) হিসাবে সাজাই এবং সেই তালিকার মধ্যবর্তী সংখ্যাটিকে লক্ষ করি, তা হলে দেখব সেই সংখ্যা আরও অনেকটাই কম—৩ লক্ষ ২০ হাজার। রাশিবিজ্ঞানে এই মধ্যবর্তী সংখ্যাটিকে বলা হয় 'মিডিয়ান' অর্থাৎ মধ্যরাশি। যদি কিছু কিছু বছরে অ-স্বাভাবিক বেশি হারে শ্রমদিবস নষ্ট হয়, তা হলে সেই সংখ্যাগুলি আমাদের পরিচিত গড়কে অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু মধ্যরাশিকে সে ভাবে বাড়াতে পারবে না। তাই অনেক সময় গড়পড়তা ছবিটা বুঝতে প্রচলিত গড়ের বদলে মধ্যরাশিই বেশি উপযোগী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের এই পরিসংখ্যানগুলিকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা দরকার। অন্যান্য রাজ্যের জন্য ১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যান নাগালে আছে। 'ইন্ডিয়ান লেবার হ্যান্ডবুক' জানাচ্ছে, সে বছর পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি ধর্মঘট হয়েছিল। দেশের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে আর কোথাও ধর্মঘটের সংখ্যা এত কম ছিল না। এই ১৬টি ধর্মঘটে ক্ষতিগ্রস্ত হন ২৭,০০০ শ্রমিক। ওই বছরেই তামিলনাড়ুতে ১৪৩টি ধর্মঘটে ক্ষতিগ্রস্ত হন ৩৭,০০০ শ্রমিক; গুজরাতে ১২৯টি ধর্মঘট হয়, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১,২০,০০০। এই পরিসংখ্যানগুলি কিন্তু একাধিক কারণে বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। এমন হতে পারে যে ধর্মঘট এড়ানোর জন্য মালিকরা শ্রমিকদের বিস্তর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তার ফলেই ধর্মঘট কম হয়েছে। যদি এমন হয়, তা হলে বিনিয়োগকারীরা স্বভাবতই নতুন লগ্নি করতে চাইবেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমনটা ঘটেছে বলে শোনা যায় না। তা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে মালিকরা যে ভাবে লকআউট করে দিতে তৎপর থাকেন তার সঙ্গেও এই তত্ত্ব মেলে না। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে লকআউটের ফলে বছরে গড়ে প্রায় ২ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। পরে অবস্থা কিছুটা শুধরেছে বটে, কিন্তু দশকের শেষে এসেও দেখা গেছে সংখ্যাটা ১ কোটির উপরে। ১৯৯৬ সালের হিসাবে দেখছি, লকআউটের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রানার-আপ হয়েছিল। ইন্ডিয়ান লেবার হ্যান্ডবুক অনুসারে সে বছর পশ্চিমবঙ্গে লকআউটের সংখ্যা ছিল ৮০। রাজ্য সরকারের সংশোধিত হিসাবে সংখ্যাটা ছিল ১৪৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, নব্বইয়ের দশকে কোনও বছরেই লকআউটের সংখ্যা ১২০'র নীচে নামেনি, যেখানে অন্যান্য রাজ্যে মধ্যরাশিটি ছিল ২০'রও নীচে। ১৯৯৬ সালে লকআউটের ফলে সব কয়টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল।

কোথা থেকে কোথায়

উৎপাদন ১৯৮০-৮১: ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের ৯.৮% পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন; ১৯৯৭-৯৮: ৫.১%।

বাণিজ্য ১৯৮৫-৮৬: দেশের আমদানি-রফতানির ১০% চলাচল করত কলকাতা দিয়ে, ১৯৯৮-৯৯: ৪%।

শিল্পায়ন ৬০-এর দশক: পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে, ১৯৯৫-৯৬: নীচের সারিতে।

এত বেশি লকআউটের ঘটনা থেকে অন্য একটা সত্যের আভাস পাওয়া যায়। অনুমান করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে মালিকরা সহজে লকআউট ঘোষণা করে দিতে পারেন বলে শ্রমিকরা চাপে থাকেন, দরকষাকষিতে তাঁদের আপেক্ষিক শক্তি কমে যায়, সেই কারণেই ধর্মঘট কম হয়। এবং মনে রাখতে হবে, ব্যবসায় ভাল লাভ হলে মালিকরা শ্রমিকদের চাপে রাখার উদ্দেশ্যে দুম করে লকআউট করে দিতে চান না। এত বেশি লকআউট দেখে আন্দাজ করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসায় তেমন লাভ নেই।

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সি আই আই) সম্প্রতি যৌথ ভাবে এক হাজারের কিছু বেশি শিল্প সংস্থার উপর একটি সমীক্ষা করেছেন। সেই সমীক্ষা থেকেও আমাদের অনুমানের পক্ষে কিছু সমর্থন মেলে। এ বিষয়ে আলোচনা পরের কিস্তিতে। *(চলবে)*

বিনিয়োগের পরিবেশ কেন ভাল নয়

পশ্চিমবঙ্গের অধোগমন
কেন

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সি আই আই) সম্প্রতি যৌথ ভাবে ভারতের এক হাজারের কিছু বেশি শিল্প সংস্থার উপর একটি সমীক্ষা করেছেন। ওঁরা বিনিয়োগের পরিবেশ অনুসারে ভারতের রাজ্যগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন এবং সেই গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে নানা তথ্য পেশ করেছেন। ওঁদের মতে যে রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের পরিবেশ খারাপ, পশ্চিমবঙ্গ সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠীতে আর আছে কেরল ও উত্তরপ্রদেশ। আর ওঁদের মতে বিনিয়োগের সর্বোত্তম পরিবেশ আছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে। তাদের তুলনায় এই বিনিয়োগ-প্রতিকূল রাজ্যগুলিতে শ্রমিক-পিছু 'ভ্যালু অ্যাডেড' বা মোট মূল্য উৎপাদনের পরিমাণ অন্তত ৩০ শতাংশ কম। তার ফলে ব্যবসায় লাভের মাত্রাও কম। (পণ্য উৎপাদন করতে কাঁচামাল দরকার হয়। উৎপন্ন পণ্যের মোট মূল্য থেকে ব্যবহৃত কাঁচামালের মোট মূল্য বাদ দিয়ে যা পাওয়া যায় সেটাই ভ্যালু অ্যাডেড, অর্থাৎ বাড়তি বা নতুন মূল্য।)

লাভের স্বল্পতাকে মূল সমস্যার কারণ বলে মনে করলে অবশ্য ঠিক হবে না, এটা আসলে গভীরতর ব্যাধির পরিণাম। 'বিনিয়োগ-প্রতিকূল' রাজ্যগুলিতে লাভের মাত্রা কম হওয়ার পিছনে কোন কারণ কতটা দায়ী, বিশ্বব্যাঙ্ক-সি আই আই

লিখেছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; অশোকসঞ্জয় গুহ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; কৌশিক বসু, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বস্টন ইউনিভার্সিটি; দেবরাজ রায়, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি; প্রণব বর্ধন, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; মুকুল মজুমদার, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; মৃণাল দত্তচৌধুরী, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স এবং মৈত্রীশ ঘটক, শিকাগো ইউনিভার্সিটি। অর্থনীতির দুনিয়ায় প্রথম সারির ন'জন পণ্ডিত। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

সমীক্ষায় তার উত্তর খোঁজা হয়েছে। শিল্প-উদ্যোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা করা হয়। এখানে একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো। বলা হয়ে থাকে, শ্রমের বাজার অনমনীয় বলে, অর্থাৎ দরকার মতো উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের বিদায় করে দেওয়া যায় না বলে কলকারখানায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক থাকেন, তার ফলে ব্যবসায় লাভ কমে যায়। কিন্তু ঘটনা হল, উপরোক্ত ব্যবসায়ীরা নিজেরাই মনে করেন যে, শ্রমের বাজারের অনমনীয়তা তথা উদ্বৃত্ত শ্রমিকের মাত্রা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মতো বিনিয়োগ-প্রতিকূল রাজ্যগুলিতে বরং কম-ই। (মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে অবশ্য উদ্বৃত্ত শ্রমিকের মাত্রা কম।) এর থেকে অনুমান করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপরিচালকদের তুলনায় শ্রমিকদে আপেক্ষিক অবস্থান বেশ দুর্বল। এর অন্য নানা ইঙ্গিতও আ তা আমরা আগেই দেখেছি।

কিন্তু আমরা এমন কথা মোটেই বলতে চাইছি না পশ্চিমবঙ্গে শ্রম-পরিস্থিতি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই বা রা সরকারের এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নে সমস্যা আছে, একাধিক সমস্যা। প্রথমত, বিশ্বব্যাঙ্ক-সি আ আই সমীক্ষা অনুসারেই, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের শিল্পসংস্থ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম শ্রমিক দিয়ে কাজ চালানো হ সুতরাং ওই দুই রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যেতে পা যে, পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত শ্রমিকের একটা সমস্যা আ দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির সমস্যা আছে। যত বেশি শ্রমনিবিড় প্রযু ব্যবহার করা হয়— অর্থাৎ এমন প্রযুক্তি যাতে শ্রমিকে প্রয়োজন আপেক্ষিক ভাবে বেশি— শ্রমিকদের জোর তত বেশি হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপরিচালকরা বহু ক্ষেত্রে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করেননি, অংশত এই কারণে এখানে শ্রমিকদের বিদায় জানানো বা সহবৎ শেখানো কঠি তাঁরা ব্যবহার করেছেন পুঁজি-নিবিড় প্রযুক্তি, ফলে শ্রমিকদে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে, দর কষাকষিতে তাঁদে আপেক্ষিক ক্ষমতাও কমেছে। তৃতীয়ত, এত দিনের শি অবক্ষয়ের চাপে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা আগের চেয়ে সংয হয়েছেন বলেই এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই যে শি উন্নয়নের গতি বাড়লে আবার অশান্তি বাড়বে না। চতুর্থ এবং সবচেয়ে বড় কথা, কেবল ধর্মঘটের প্রাবল্য বা উগ্র শ্রমিকের প্রাদুর্ভাব দিয়ে শ্রম-পরিস্থিতি বিচার করা যায় না।

এর পর চারের পাত

বিনিয়োগের পরিবেশ

প্রথম পাতার পর

কলকারখানায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ফলে যদি শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেন বা সুবিধাবাদী হয়ে পড়েন, তা হলেও উৎপাদনশীলতার ক্ষতি হবে। এ বার, দর কষাকষিতে যদি পরিচালকদের কব্জির জোর বেশি হয়, তা হলে তাঁদের তেমন লোকসান হবে না, মার খাবেন শ্রমিকরাই, তাঁদের মজুরি কমে যাবে। বস্তুত, বিশ্বব্যাঙ্ক-সি আই আই সমীক্ষা অনুসারে, যে দুটি রাজ্যে বিনিয়োগের সেরা পরিবেশ আছে, সেই গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় বিনিয়োগ-প্রতিকূল রাজ্যগুলিতে মজুরির হার গড়পড়তা ২৫ শতাংশ কম।

সমীক্ষা রিপোর্টে বিনিয়োগ-প্রতিকূল রাজ্যগুলির প্রধান সমস্যা হিসাবে তিনটি বিষয়কে দায়ী করা হয়েছে: অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ, দুর্বল পরিকাঠামো এবং দক্ষতার ঘাটতি। সরকারি ইনস্পেক্টররা কত বার একটি শিল্পসংস্থায় পরিদর্শনে যান, সেই পরিসংখ্যানকেই অতিনিয়ন্ত্রণের সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে, গুজরাত বা মহারাষ্ট্রে একটি শিল্পসংস্থায় বছরে গড়পড়তা যত বার ইনস্পেক্টরের আগমন ঘটে, বিনিয়োগ-প্রতিকূল রাজ্যগুলিতে পরিদর্শনের সংখ্যা তার প্রায় দ্বিগুণ। এটা ঠিকই যে, এই ইনস্পেক্টর-হানায় সময় নষ্ট হয়, দুর্নীতির সম্ভাবনাও বাড়ে। কিন্তু ইনস্পেক্টররা বেশি আসেন বলেই শিল্প-উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন। (খুব ছোট শিল্পসংস্থার ক্ষেত্রে এটা সত্যি হতে পারে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব।) অনুমান করা যায়, ইনস্পেক্টরের পরিদর্শনের মাত্রা সরাসরি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু একটি গভীরতর ব্যাধির লক্ষণ হিসাবে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে সরকার এত বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে ভালবাসে, তার কাছে বিনিয়োগকারীদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার বিশেষ আশা নেই। তাই ইনস্পেক্টর-হানা বন্ধ করলেই সব গোল চুকে গেল, ব্যাপারটা এত সোজা নয়, প্রশাসন যদি প্রকৃত অর্থে বিনিয়োগের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তবেই কাজ হবে।

দুর্বল পরিকাঠামোর পরিণাম আরও সহজেই বোঝা যায়। বুদ্ধদেব ঘোষ সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে (*সিকি শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ কোথা থেকে কোথায় পৌঁছল*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মে) দেখিয়েছেন, ১৯৭১-৭২ সালে পরিকাঠামোর মাপকাঠিতে ভারতের রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল চতুর্থ। ১৯৯৭-৯৮ সালে এই রাজ্য নেমে আসে চতুর্দশ স্থানে। এখানে পরিকাঠামোর ছয়টি দিকের হিসাব নেওয়া হয়েছে: (১) রাস্তাঘাট, রেল ও বন্দর, (২) জলসেচ, (৩) বিদ্যুৎ, (৪) টেলিফোন, (৫) ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণের অনুপাত এবং (৬) রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়। এই তালিকার প্রত্যেকটি বিষয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সারা দেশে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে, এখন সে প্রত্যেকটিতেই নেমে এসেছে সর্বভারতীয় গড়ের নীচে। স্পষ্টতই, শিল্পায়নে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরিকাঠামোর আপেক্ষিক দুর্বলতা।

রাস্তাঘাট ভাল না হলে মালপত্র পরিবহণে দেরি হয়, খরচ বাড়ে। বিশেষত, ফুল বা মাছের মতো পণ্য সময়মত গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে না পারলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়, গোটা উৎপাদনই অর্থহীন হয়ে পড়ে। পূর্ব ভারতে শিল্পের রুগ্‌ণতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন সুদীপ চৌধুরী ও অনিন্দ্য সেন। তাঁরা পুরুলিয়ার একটি মিনি-ইস্পাত কারখানার কথা জানিয়েছেন। পরিবহণের সমস্যার জন্য কারখানাটিকে বছরে বাড়তি ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হত। (লক্ষণীয়, এই কারখানাটি গুটিয়ে ফেলার সময় তার সম্পদের মোট দাম নির্ধারিত হয়েছিল সাকুল্যে ৮১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।) প্রসঙ্গত, মাথাপিছু রাস্তার দৈর্ঘ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বভারতীয় গড়ের নীচে।

উৎপাদনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল বিদ্যুৎ। চৌধুরী-সেন রিপোর্টে অনেকগুলি শিল্পসংস্থার কথা আছে, যেগুলি কেবল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে প্রতিশ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ না পাওয়ার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। দাবি করা হয় যে এখন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের হাল অনেকখানি ফিরেছে, কিন্তু সেটা কতটুকু বাড়তি জোগানের সুফল আর কতটা শিল্পে অবক্ষয়ের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যাওয়ার পরিণাম, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তা ছাড়া, কলকাতা শহরের বাইরে বিদ্যুতের হাল অনেক খারাপ। আর, মনে রাখতে হবে, ব্যবসায়ীর কাছে কেবল বিদ্যুতের মোট জোগানটাই সব নয়, সেই জোগান নিয়মিত ও নিয়মমতো পাওয়া যাবে, এই নিশ্চয়তাও অত্যন্ত জরুরি। চৌধুরী-সেন রিপোর্টে বার বার নজির দেখানো হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের যে প্রত্যাশার ভিত্তিতে ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তা পূর্ণ হয়নি, ফলে ব্যবসা মার খেয়েছে। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে আগামী বেশ কিছু কালের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি সামগ্রিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা পেশ করতে হবে বিনিয়োগকারীদের কাছে। বস্তুত, ভাল হয় যদি সরকার প্রতিটি জেলার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয় এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ না হলে ক্ষতিগ্রস্ত (নথিভুক্ত) বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দেয়।

পরিকাঠামোর পরীক্ষা

বিষয়:
১. রাস্তাঘাট, রেল, বন্দর
২. জলসেচ
৩. বিদ্যুৎ
৪. টেলিফোন
৫. ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণের অনুপাত
৬. রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়

প্রতিযোগী: ভারতের সব রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গের ফল	
১৯৭১-৭২	চতুর্থ
১৯৯৭-৯৮	চতুর্দশ

পরিকাঠামোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যোগাযোগ (কমিউনিকেশন)। আগে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল, এখন অবস্থা অনেকটা ভাল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ধরনের উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প গড়তে উৎসাহী তার সঙ্গে তথ্য পরিবহণের পরিকাঠামো যে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সে কথা তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। এটা আশার কথা। এটাও সত্যি যে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে দ্রুত এগিয়ে যেতে তৎপর হয়েছে, যোগাযোগের পরিকাঠামোয় উন্নতি সাধনের জন্য সম্প্রতি বেশ কিছু উদ্যোগ করেছে। তা ছাড়া, এখনকার উদার আর্থিক ব্যবস্থায় আশা করা যেতে পারে, সরকারি আয়োজনে যেখানে যা ফাঁক থাকবে, বেসরকারি উদ্যোগীরা তা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন।

বিশ্বব্যাঙ্ক-সি আই আই সমীক্ষায় যে তিনটে সমস্যার কথা বলা হয়েছিল তার তৃতীয়টি হল দক্ষতার ঘাটতি। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে এর সমর্থন মেলে। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে (এন এস এস) অর্থাৎ জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (১৯৯৩-৯৪) অনুসারে সারা দেশে গড়পড়তা হিসাবে ৫ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের ৫২.১ শতাংশ প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই অনুপাত হল ৫১.৭ শতাংশ, অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড়ের নীচে। বস্তুত, ১৫টি বড় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১০ নম্বরে। তার উপরে আছে অসম (৬২.৭ শতাংশ), গুজরাত (৬০.৪), হরিয়ানা (৫৩.৩), হিমাচল প্রদেশ (৭৯.৫), কর্নাটক (৫৯.৯), কেরল (৮৩.৮), মহারাষ্ট্র (৬৩.২), পঞ্জাব (৭১.২) এবং তামিলনাড়ু (৭৪.৬)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে (*দ্য স্টেটাস অব প্রাইমারি এডুকেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*, আর চট্টোপাধ্যায়, এস চৌধুরী, এস কে ঘোষ, এ কে সেন এবং ভি এন রেড্ডি)। তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির নেট হার ৫০.৭ শতাংশ। সংখ্যাটি জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাবের বেশ কাছাকাছি। অনুরূপ সংকেত মিলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টেও। তাতে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরের আগে, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরেই, পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার (ড্রপ আউট) হার সিকিমে সবচেয়ে বেশি, তার পরে বিহার, এবং তৃতীয় স্থানেই পশ্চিমবঙ্গ (*পড়া শেষ না করেই পঃবঙ্গে স্কুল ছাড়ছে ৮২% পড়ুয়া*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জুন, ২০০১)।

তবে বর্তমান উৎপাদনশীলতার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বর্তমান শ্রমিক-কর্মীদের শিক্ষার মান। এ ব্যাপারে কিন্তু সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খারাপ নয়। তার কারণ হল, এই শ্রমিক-কর্মীরা যখন লেখাপড়া শিখেছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান অধিকাংশ রাজ্যের চেয়ে ভাল ছিল। সুতরাং পড়াশোনা কম করেছেন বলে পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা দক্ষতায় খাটো হয়ে পড়েছেন, এমন যুক্তি ধোপে টিকবে না। অবশ্যই, এখন যারা স্কুলে পড়ছে তারাই ভবিষ্যতের কর্মী হবে, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষায় আজকের ব্যর্থতার মাসুল হয়তো গুনতে হবে আগামী কাল। কিন্তু উৎপাদনশীলতা অতীতে কেন কম হয়েছে বা বর্তমানে কেন কম রয়েছে, কর্মীদের গড়পড়তা শিক্ষার মান বিচার করে তার সদুত্তর মিলবে বলে মনে হয় না।

(চলবে)

শিক্ষা নীতিতে বিস্তর গোলমাল

পশ্চিমবঙ্গের সংকট ও সম্ভাবনার কথা বিশ্লেষণ করতে সম্মিলিত হয়েছেন অর্থনীতির দুনিয়ার প্রথম সারির ৯ জন পণ্ডিত। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; অশোকসঞ্জয় গুহ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; কৌশিক বসু, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বস্টন ইউনিভার্সিটি; দেবরাজ রায়, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি; প্রণব বর্ধন, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; মুকুল মজুমদার, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; মৃণাল দত্তচৌধুরী, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স এবং মৈত্রীশ ঘটক, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো। আজ তৃতীয় কিস্তি।

গত দুই দশকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। দিল্লি এবং অন্যান্য শহরে যখন অগণিত মানুষ বাইরে থেকে এসে বসবাস শুরু করেছেন, কলকাতায় অভিবাসনের মাত্রা তখন অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অবনতির কারণও বটে, পরিণামও বটে। এক দিন দক্ষিণ ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেমেয়েরা ভাগ্য ফেরাতে কলকাতায় আসতেন, আজ ছবিটা পুরোপুরি উল্টে গেছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা অন্য সকলের আগে অভিবাসন করেছিলেন এবং এ রাজ্যে যাঁরা সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত অভিবাসী, সেই মারোয়াড়িরাও আজ আর কলকাতার পথপ্রান্তে পরশপাথর খোঁজেন না।

এই উল্টোরথের যাত্রা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেন এমন হয়, তার একটা উত্তর মেলে বড় শহরের চরিত্রেই। মহানগর হল একটি বিশাল সম্মিলনী। সেখানে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বা প্রতিভা একত্র করা যায়। ওয়েল্ডিংয়ের কাজে যিনি ওস্তাদ, তিনি জানেন এক জন প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ারই তাঁর গুণের কদর বুঝবেন। সেরা ইঞ্জিনিয়ার চাইবেন এমন শিল্পোদ্যোগীর সঙ্গে কাজ করতে, যিনি কঠিনতম প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের জমি দখল করে নিতে চান। আবার সেই ইঞ্জিনিয়ারকে যদি ঠিক ভাবে কাজ করতে হয় তা হলে এমন চাই মেটিরিয়ালস ম্যানেজার যিনি সবচেয়ে ভাল জিনিসটি ছাড়া কেনেন না। এমন সব জহুরি সেই শহরেই আসতে চাইবেন যেখানে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। তা ছাড়া, প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা সব সময়েই চাইবেন অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে— বন দেশে শেয়াল রাজা হয়ে বসে থেকে মন ভরবে কেন? এই কারণেই বিভিন্ন বিষয়ে গুণীরা বড় শহরে সমবেত হন। এই কারণেই মহানগরগুলি ক্রমশ জনবহুল হয়ে চলে; এত ভিড়, এত সমস্যা, জীবনধারণের খরচ এত বেশি, তবু মানুষ সেখানেই থাকতেই চায়। মুম্বই বা দিল্লির কথা ভাবুন; কাজের জায়গা থেকে কত দূরে বাসা মেলে, সে বাসাও পায়রার খোপের মতো, রোজ দীর্ঘ পথ কত কষ্ট করে যাওয়া-আসা করতে হয়, তা সত্ত্বেও মানুষ দলে দলে সেখানে বাসা বাঁধছে।

আবার ঠিক এই কারণেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষার নদী যখন গতি বদলায়, সেই পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুত। প্রতিভাবান তরুণরা যেই এক বার কলকাতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, অমনি পরের প্রজন্মের তরুণরাও স্থির করলেন যে ভাগ্যান্বেষণে অন্য কোথাও যেতে হবে। তার পর এক সময় ওই তরুণদের অগ্রজরাও উপলব্ধি করলেন, দেশে প্রতিভাবান তরুণ সহযোগীর ঘোর অনটন, তখন তাঁরাও বললেন— হেথা নয়, অন্য কোনও খানে।

আর একটা কারণে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে রাজ্যে শিল্প-অবনতির তাড়নায় প্রতিভার পলায়ন শুরু হয়েছিল। তার পরবর্তী অধ্যায়ের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে, অন্তত ১৯৯০ সাল পর্যন্ত, রাজ্য সরকার সমস্ত রাজনৈতিক উদ্যম গ্রামাঞ্চলে সংহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অনেক দিক দিয়ে হয়তো এটা ঠিক সিদ্ধান্তই ছিল, কিন্তু কলকাতা তথা শহরের প্রতি অবহেলার পরিণাম শুভ হয়নি। রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ছে, বছরের পর বছর বিদ্যুৎ ঘাটতির কোনও সুরাহা হয় না, চার দিকে একটা গভীর অবক্ষয়ের পরিবেশ— এমন শহরে তরুণ ভাগ্যান্বেষীরা আসতে চাইবেন কেন? তার ওপর, এই সময়েই অন্য নানা শহরে উচ্চ মধ্যবিত্তের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিপুল আয়োজন হয়েছে: আধুনিক বিলাসবহুল আবাসন, ক্লাব, ডিস্কো, রেস্তোরাঁ, বিনোদনের সম্ভার নিয়ে তৈরি পার্ক, আরও কত কী। আর কলকাতা? জীবন উপভোগ নিয়ে এ শহরের মনে

এর পর চারের পাতায়

শিক্ষা নীতিতে গোলমাল

প্রথম পাতার পর

চিরকালই দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্ত নেই, তাই এই নতুন যুগেও সুখী, বিনোদন-সমৃদ্ধ জীবনের দাবি সে পূরণ করতে পারল না। এই যুগের উচ্চাভিলাষী তরুণরা এমন শহর ছেড়ে চলে যাবে তার আর আশ্চর্য কী?

সেই থেকে কলকাতা আরও অনেক বেশি করে মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক শহরে পরিণত হয়েছে। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেয় যে, পুরনো শিল্পনগরীর জীবনযাত্রার গুণমানে উন্নতি ঘটলেও সেই শহরের সমৃদ্ধি আসে না, অর্থনৈতিক ভাবে সে পিছিয়ে পড়তেই থাকে। ক্লিভল্যান্ড, বাল্টিমোর, পিটসবার্গ— দৃষ্টান্ত অনেক। পিটসবার্গকে তো ইদানীং হামেশাই আমেরিকার সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই শহরগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটছে না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যাঁদের বয়স কম, যাঁদের চোখে সাফল্যের স্বপ্ন, তাঁরা সবার আগে চাইবেন সমগোত্রীয়, সমমনস্ক মানুষের কাছাকাছি থাকতে, তাতে যদি জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা বিনোদনের সুযোগ একটু কম হয় তো হোক।

কলকাতায় দক্ষতার জোগান ভীষণ ভাবে কমে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে অবস্থায় বিশেষ উন্নতির আশাও নেই। আগামী দশকের শিল্প-নীতি রচনা করতে বসে এই বাস্তবের কথা মনে রাখা দরকার। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। যে সব শিল্পে জ্ঞানের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেমন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্প, যারা 'হাই-টেক' শিল্প হিসাবে সমধিক পরিচিত, সেগুলির ওপর অত্যধিক ভরসা করলে ভুল হবে। কলকাতা রাতারাতি বাঙ্গালোর বা হায়দরাবাদ হয়ে যাবে, তা সম্ভব নয়। এই শিল্পগুলিতেই উচ্চস্তরের দক্ষতা সব চেয়ে বেশি আবশ্যক। তা ছাড়া, যেখানে এ ধরনের অনেক শিল্প ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে, সেখানে নতুন উদ্যোগের সুযোগ ও সম্ভাবনা বেশি, নতুন জায়গায় এ সব শিল্পের বিকাশ তুলনায় কঠিন, সময়সাপেক্ষ। সিলিকন ভ্যালি-র কথা ভাবুন, অগণিত তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সমাবেশেই তো ওই শিল্পাঞ্চলের এমন সমৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প প্রসারের একটা উপায় হতে পারে খুব বড় একটি (বা একাধিক) শিল্পসংস্থাকে ডেকে আনা, যে সংস্থা আরও বহু উদ্যোগীকে আকর্ষণ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল-এ মাইক্রোসফট এই ভূমিকা নিয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু আশাব্যঞ্জক সংকেত পাওয়া গেছে। আজিম প্রেমজির উইপ্রো এবং পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের টি সি জি কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে সি আই আই। কিন্তু এই উদ্যোগগুলিকে কেন্দ্র করে একটা সমৃদ্ধ শিল্পগুচ্ছ গড়ে ওঠে কি না, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। ভুলে গেলে চলবে না, এই শিল্পে দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্য আগেই বেশ কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ দেরিতে শুরু করেছে। আর, এখানে প্রতিযোগিতাও কঠিন।

এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান সুবিধা হল এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তি। রাজ্যে প্রতি বছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এবং বাণিজ্য শিক্ষায় ডিগ্রি নিয়ে বেরোন, আর সাধারণ ভাবে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তো আছেনই। উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পে যে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়, সে জন্য শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীর একটি সতত প্রসরমাণ ভাণ্ডার থাকা দরকার, পশ্চিমবঙ্গে সে-ভাণ্ডার ভাল ভাবেই থাকা উচিত। কলেজ শিক্ষকের পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আয়োজিত 'নেট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্নাতকদের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যের আগে।

আজিম প্রেমজি (উইপ্রো) এবং পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় (টি সি জি)। *এই দুজনের দুটি উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের দুই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।*

কিন্তু এই সফল প্রার্থীদের অনেকেই পরে মনোমত চাকরির খোঁজে অন্য রাজ্যে বা অন্য দেশে পাড়ি দেন। এবং নানা লক্ষণ থেকে বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের উচ্চশিক্ষার যে বিপুল চাহিদা আছে, রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই অনুসারে জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রযুক্তি-বিদ্যা শিখতে বহু ছাত্রছাত্রী বাঙ্গালোর যাচ্ছেন। প্রতি বছর সেখানকার কলেজ বা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে কলকাতা থেকে এত ছেলেমেয়ে যান যে আজকাল নাকি তাঁদের জন্য বিশেষ ট্রেনের বন্দোবস্ত হয়েছে। শিক্ষার জন্য প্রবল চাহিদার আঁচ পাওয়া যায় আর এক ধরনের তথ্যেও। অঞ্জিনী কোচার গবেষণা করে দেখিয়েছেন, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি অংশ টিউশনি নেন। আর, বাঙালি সংস্কৃতিতে শিক্ষার মর্যাদা তো চিরদিনই বেশি। এখানেই অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের এক বড় সুযোগ।

বস্তুত, রাজ্যে শিক্ষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিবেচনা করলে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক পা এগিয়ে যেতে পারে; উচ্চশিক্ষাকেই একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে গণ্য করা যায় এবং সেই শিল্পে বিনিয়োগ করতে উদ্যোগীদের উৎসাহ দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের চার পাশে এমন একাধিক রাজ্য আছে যেখানে শিক্ষার ছন্নছাড়া অবস্থা, ফলে সম্পন্ন অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের দিল্লিতে স্কুলে পড়তে পাঠান। পশ্চিমবঙ্গ যদি ভাল স্কুল এবং কলেজ তৈরি করে অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয় খরচে সেখানে পড়ার সুযোগ দেয়, প্রতিবেশী অঞ্চলের চাহিদার একটি অংশ অনায়াসে মেটাতে পারবে। কয়েক দশক আগে সেটাই হত, পূর্ব ভারতের সবচেয়ে ভাল ছাত্ররা কলকাতার স্কুলকলেজে পড়তে আসতেন।

এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারের নীতিতে আমূল সংস্কার ঘটানো জরুরি। কিছু প্রতিষ্ঠানকে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রত্যয়ে তৎপর হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও গবেষকদের সেখানে নিয়ে আসতে হবে, কাজের যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। গত দুই দশকে অতিরিক্ত সাম্যবাদের দাপটে এবং রাজনীতির প্রভাবে উচ্চশিক্ষায় গুণমানের ক্ষতি হয়েছে, এই প্রবণতা দ্রুত ও প্রবল ভাবে রোধ করা দরকার, ফেরা দরকার উৎকর্ষের সাধনায়। প্রথমত, শিক্ষক নিয়োগের সমগ্র আয়োজনটাই আপাদমস্তক রাজনীতির বশীভূত হয়ে পড়েছে। তার ওপরে আছে চাকরির নিঃশর্ত নিরাপত্তা, কাজ না করলেও চাকরি যাবে না। পদোন্নতি এবং বদলির ব্যাপারেও কাজের গুণাগুণ বিচার তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যথেষ্ট বেশি দিন চাকরি হলে এবং ঠিক ঠিক রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকলেই পদোন্নতি হয়ে যায়, পছন্দমতো বদলির (বা বদলি না করার) ব্যবস্থা হয়।, ফলে শিক্ষকদের কোনও জবাবদিহির দায় নেই। অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সরকারি বা সরকারি টাকায় চালিত, তাই সরকার যা খুশি করে পার পেয়ে যায়। এর পরিণাম কী হতে পারে তার প্রকট নিদর্শন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সবের ওপরে রয়েছে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ক ভুল নীতি। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসুচি থেকে ইংরেজিকে বিদায় জানানোর ফলে ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে; বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতিতে দক্ষতার একটি মৌলিক শর্ত হল, ইংরেজি জানতে হবে। (অবশ্য নতুন মুখ্যমন্ত্রী সদ্য জানিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি পড়ানো শুরু হবে।) কী ভাবে ইংরেজি জ্ঞান কাজে লাগে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভারতের চেয়ে দরিদ্র দেশ ঘানা। দরিদ্র বলেই দেশে মজুরি কম। কর্মীরা ইংরেজি জানেন, কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানেন। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে সেখানে বহু মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা সংস্থার হয়ে তথ্য প্রেরণ (ডেটা ট্রান্সমিশন) বা অপারেটর পরিষেবার কাজ করে দিচ্ছেন। ঘানার মাথাপিছু আয় বছরে গড় প্রায় ৩৮০ ডলার, সেখানে এক জন সুদক্ষ তথ্যকর্মী (ডেটা প্রসেসর) মাসে ৩০০ ডলার আয় করছেন। স্পষ্টতই, ঘানা একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। *(চলবে)*

ক্ষুদ্র শিল্পকে ছোট করলে ভুল হবে

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে আমরা এর আগে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। সমস্যা সমাধানের উপায় কী? প্রথমত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও অনেক বেশি স্বশাসনের অধিকার দিতে হবে এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে মেধা ও কৃতিত্বের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি উদ্যোগে সম্পূর্ণ নতুন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উৎসাহ দেওয়া দরকার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হয় তা হলে তাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি দিতে হবে। সেখানে শিক্ষক-গবেষকের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করবেন ছাত্ররা এবং অন্য শিক্ষক-গবেষকরা, আর সেই কৃতিত্বের প্রমাণই হবে স্বীকৃতি ও উন্নতির মাপকাঠি। ছাত্রদের বেতন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের বেতন, তাঁদের মূল্যায়ন এবং কাজের পরিবেশ-পরিকাঠামো— এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে তাদের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাজ করতে না-হয়।

অন্য দিকে, বেসরকারি উদ্যোগ এবং অন্য রাজ্যের বা অন্য দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেবে রাজ্য সরকার। সে জন্য পরিকাঠামো তৈরি করে দিতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের সংকট ও সম্ভাবনার কথা বিশ্লেষণ করতে সম্মিলিত হয়েছেন অর্থনীতির দুনিয়ার প্রথম সারির ৯ জন পণ্ডিত। **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; **অশোকসঞ্জয় গুহ**, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; **কৌশিক বসু**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**, বস্টন ইউনিভার্সিটি; **দেবরাজ রায়**, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি; **প্রণব বর্ধন**, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; **মুকুল মজুমদার**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **মৃণাল দত্তচৌধুরী**, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স ও **মৈত্রীশ ঘটক**, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো। আজ চতুর্থ কিস্তি।

সরকারকেই, অন্য নানা বিষয়েও সহযোগিতা করতে হবে (যেমন জমি প্রস্তুত করা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি), প্রয়োজনে বেসরকারি বিনিয়োগের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে সরকার এবং সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। বিশেষত, পরিচালন-গোষ্ঠীতে কাউকে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি, রাজনৈতিক পরিচয় নয়। চেষ্টা করতে হবে, ভাল ছাত্র এবং শিক্ষক নিয়ে আসার জন্য নতুন আর পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। এর পরিণামে যদি পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ভাল ছাত্র এবং শিক্ষক চলে যান, তা হলে সেটাই মেনে নিতে হবে, কারণ এটাই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাটিকে নাড়া দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবধি সর্বস্তরে নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উৎসাহ দিতে হবে। এখন যে সব স্কুলের প্রবল নাম আছে এবং প্রবল চাহিদা আছে, তারা যদি কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে একাধিক শাখা খুলতে চায়, তা হলে তাদের বাধা দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। দিল্লি পাবলিক স্কুল বা স্প্রিংডেলস দিল্লিতে এমনটিই করেছে। বস্তুত, দিল্লির স্কুলগুলিও যদি কলকাতায় শাখা খুলতে চায়, তাদের সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া উচিত। সরকারের দায়িত্ব দুটি ক্ষেত্রে সীমিত রাখতে হবে। এক, অভাবী ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা; দুই, বেসরকারি উদ্যোগে যথেষ্ট নতুন স্কুল তৈরি না হলে সেই ঘাটতি পূরণ করা।

আর এক ধরনের সংস্কারও জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্কারের পথে ইতিমধ্যেই কিছু অগ্রগতি হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ওপর উত্তরোত্তর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শিল্পসংস্থাগুলি সেখানে সরাসরি যোগাযোগ করে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের চাকরির সুযোগ দিতে পারে। এ সবই দরকারি কাজ। কিন্তু এর থেকেও বড় সুযোগ আছে অন্য দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমত, অল্প পুঁজির উদ্যোগীদের সাহায্য করার জন্য শিক্ষানবিশি এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রচলিত

এর পর চারের পাতায়

ছোট করলে ভুল

প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থাকে জোরদার করা যায়। দ্বিতীয়ত, গবেষণাগার এবং উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের যৌথ উদ্যোগে গবেষণার কাজে উৎসাহ দেওয়া যায়। বস্তুত, উচ্চশিক্ষার প্রসারকে কাজে লাগিয়ে এমন গবেষণাগার গড়ে তোলা সম্ভব যেগুলি ব্যবসায়িক ভাবে লাভজনক হতে পারে। এখনও বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকেই ডিগ্রি পাওয়ার পরে গবেষণায় আসতে চান। তাই বেসরকারি অর্থে এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় যেখানে অগ্রবর্তী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষাদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে গবেষণা করা হবে। জৈবপ্রযুক্তির মতো কিছু কিছু বিষয়ে এমন বাণিজ্যমুখী গবেষণার ভাল সম্ভাবনা আছে।

পরিকাঠামো এবং শিক্ষায় নতুন উদ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পরে আমরা নতুন শিল্প-নীতির তৃতীয় বিষয়টির কথা বলব, সম্ভবত তার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। বিষয়টি হল, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সেই সব ক্ষুদ্র শিল্প যেগুলিতে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় না। এই গোত্রের শিল্পসংস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প সফল হবে কি না, হলে কতটা সফল হবে, তা আগে থেকে বলা শক্ত।

আমরা আগেই বলেছি, এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা আছে— পশ্চিমবঙ্গ এই ধরনের শিল্পে মন দিয়েছে অনেকটা দেরিতে, ইতিমধ্যে দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্যে সমৃদ্ধ উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প-এলাকা গড়ে উঠেছে, সুতরাং প্রতিযোগিতা জোরদার। উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পাঞ্চল কোথায় তৈরি হবে এবং সফল হবে, তার পূর্বাভাস দেওয়া সব সময়েই কঠিন। বহু বিনিয়োগকারী এবং দক্ষ বৃত্তিজীবী এক জায়গায় সমবেত হওয়া চাই, অথচ তাঁদের এক জন কোথায় আসবেন তার ওপরে আর এক জনের স্থান-নির্বাচন নির্ভর করে। গত বছর থেকে দুনিয়া জুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভাটার টান লেগেছে। এই শিল্পের হাতে আপন ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ সমর্পণ করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে না।

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে নানা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এর অভিজ্ঞতা দেখুন। একটা বিরাট যৌথ উদ্যোগ, তার শরিকরা সব এক এক জন এক এক রকমের, সকলকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ চালানোই কঠিন হতে পারে। সমস্যা দেখা দিতে পারে প্রকল্পের অর্থ সংস্থান নিয়েও। হলদিয়ায় ইতিমধ্যেই এ সব প্রশ্নে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এত বড় শিল্প প্রকল্প পরিচালনার কাজে আরও গভীর সমস্যা থাকে। শিল্প সংস্থা আয়তনে যত বড় হয়, (এবং হলদিয়ার প্রকল্পটি সত্যই অতিকায়,) তার সাফল্য তত বেশি করে ম্যানেজারদের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে— ম্যানেজাররা কর্মীদের থেকে যত দূরবর্তী হন, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট তত কঠিন হয়; যত বেশি রকমের উপকরণ যত বেশি পরিমাণে কিনতে হয়, মেটিরিয়ালস ম্যানেজারদের উপর তত চাপ পড়ে। অন্তত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এটা তো দেখাই যায় যে শিল্পসংস্থা যত বড়, ম্যানেজারদের বেতন তত বেশি। ধরে নেওয়া যায়, বৃহদায়তন সংস্থায় ম্যানেজারদের গুরুত্ব সমধিক বলেই এটা হয়ে থাকে। সুতরাং, যেখানে দক্ষতার ঘাটতি আছে (এ ক্ষেত্রে দক্ষতা বলতে ম্যানেজারদের দক্ষতা) সেখানে সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে বৃহৎ শিল্পসংস্থা। আমরা আগে সুদীপ চৌধুরী এবং অনিন্দ্য সেন কৃত যে সমীক্ষাটির কথা বলেছি তাতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হয়েছে, কী ভাবে

পশ্চিমবঙ্গের চাই ক্ষুদ্র শিল্প

কেন ১. প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ
২. স্থানীয় শিল্পের ঐতিহ্য, যেমন হাওড়ার যন্ত্রপাতি, মেটিয়াবুরুজের পোশাক
৩. প্রচুর স্বল্পসঞ্চয়

কী কী কয়েকটি সম্ভাবনা: শস্তা খেলনাপাতি, ঘড়ি, স্টিরিয়ো, পোশাক, চর্মজ সামগ্রী, তৈরি খাবার, যন্ত্রাংশ।

সারমর্ম:
চিনের পথই আমাদের পথ

গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি

ম্যানেজারদের ভুল সিদ্ধান্ত একটি সংস্থার ব্যর্থতা ডেকে আনে। পশ্চিমবঙ্গে যে এত লকআউট হয় তার জন্যও হয়তো পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী; ম্যানেজাররা কর্মীদের সঙ্গে ঠিক ভাবে বোঝাপড়া করে উঠতে পারেন না বলেই শেষ পর্যন্ত দরজায় তালা ঝোলাতে হয়েছে। আমরা সবাই নিশ্চয়ই আশা করব যে হলদিয়া প্রকল্প দাঁড়িয়ে যাবে এবং উন্নতি করবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য শুধু একটি প্রকল্পের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তৃতীয়ত, এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এবং উচ্চ প্রযুক্তির বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পগুলি যদি সফল হয়ও, গোটা রাজ্য সেই সাফল্যের অংশীদার হতে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্য জুড়ে মফস্সল শহরগুলিতেও আধা-দক্ষ বা অ-দক্ষ কর্মীরা যথেষ্ট কাজ পাবেন তো? তাঁদের কাজের মজুরি যথেষ্ট বাড়বে তো? শস্তা খেলনাপাতি, ঘড়ি, স্টিরিয়ো এবং ঘরগেরস্থালির নানা জিনিসপত্রের একটি বিস্তীর্ণ বাজার ছড়িয়ে রয়েছে দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট শিল্পসংস্থাগুলি যদি এই সব জিনিস ঠিক ভাবে তৈরি করতে পারে, ভাল ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। চিন এখন এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়েই গোটা দুনিয়ায় চুটিয়ে ব্যবসা করছে। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র শিল্পের তালিকায় আরও কয়েকটি জিনিসের নাম যোগ করা যায়, যথা— পোশাক, চর্মজ সামগ্রী, তৈরি খাবার, যন্ত্রাংশ এবং নানা ধাতব পদার্থ। এই ধরনের পণ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে।

চিনের অনুসৃত পন্থাটি বিশেষ আকর্ষণীয়, কারণ সেখানে যে সব শিল্প গড়ে তুলতে জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি শ্রমনিবিড় (অর্থাৎ সেখানে শ্রমের ব্যবহার আপেক্ষিক ভাবে বেশি) এবং সেগুলিতে বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু মানুষ জড়িত। চিনের মোট শিল্প উৎপাদনের অনেকখানিই সম্পন্ন হয় ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে, তুলনায় ছোট আকারের শিল্পসংস্থায়। (এই ব্যবস্থাটিকে অনেক সময় কিছুটা রসিকতা করে বলা হয় ‘পিপলস ক্যাপিটালিজম’ অর্থাৎ জনগণের ধনতন্ত্র।) আসলে সে দেশের নীতিকাররা এমন সব শিল্প বেছে নিয়েছেন যাতে এক জন উদ্যোগী সীমিত শিক্ষা, অল্প পুঁজি ও আধা-দক্ষ কর্মী নিয়ে এবং কোনও পেশাদার ম্যানেজার ছাড়াই বেশ ভাল রকমের উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে পারেন। পঞ্জাবেও এই ধরনের শিল্পায়ন ঘটছে, যদিও পণ্যগুলি সেখানে আলাদা। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গেও নানা ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের সাফল্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এক কালে হাওড়ার যন্ত্রশিল্পের ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল। এখনও ভারতের নানা শহরে পোশাকের দোকানে মেটিয়াবুরুজ এবং দক্ষিণবঙ্গের আরও কিছু এলাকায় তৈরি পোশাক ভাল বিক্রি হয়।

তা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হাতে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম নয়, অথচ সেই সঞ্চয় বিনিয়োগের ভাল জায়গা নেই। লক্ষণীয়, পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু স্বল্পসঞ্চয়ের অঙ্ক মহারাষ্ট্র, গুজরাত বা কর্নাটকের মতো সম্পন্ন রাজ্যের চেয়েও বেশি। কৃষির সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই এর একটা কারণ। ধরে নেওয়া যায়, এই সঞ্চয়ের অনেকখানিই রয়েছে ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে, যেখানে শ্রম বিশেষ শস্তা, সুতরাং স্থানীয় শিল্প নির্মাণের আপেক্ষিক সুবিধা বেশি। এ ছাড়া, কৃষিতে যত বেশি বৈচিত্র্য আসবে, খাদ্যশস্যের বাইরে নানা ধরনের ফসল ফলানো হবে, ততই কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনাও বাড়বে।

প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গের যদি এতই সুযোগ এবং সম্ভাবনা, এত দিনে তবে নানা ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটল না কেন? প্রধান বাধাগুলি কী? কী ভাবেই বা সে সব বাধা দূর করা যায়? *(চলবে)*

প্রতিযোগিতা যত বাড়বে ততই মঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গের সংকট ও সম্ভাবনার কথা বিশ্লেষণ করতে সম্মিলিত হয়েছেন অর্থনীতির দুনিয়ার প্রথম সারির ৯ জন পণ্ডিত। **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; **অশোকসঞ্জয় গুহ**, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; **কৌশিক বসু**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**, বস্টন ইউনিভার্সিটি; **দেবরাজ রায়**, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি; **প্রণব বর্ধন**, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; **মুকুল মজুমদার**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **মৃণাল দত্তচৌধুরী**, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স ও **মৈত্রীশ ঘটক**, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো। আজ পঞ্চম ও শেষ কিস্তি।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু নানা বাধাবিপত্তিতে সেই সম্ভাবনা পূর্ণ হয়নি। প্রধান বাধাগুলি কী কী? সেগুলি দূর করার উপায়ই বা কী?

একটা সমস্যা হল, ভাল রাস্তা নেই। মেটিয়াবুরুজে পোশাক তৈরির বড় ঘাঁটি, হাওড়া হাটে পোশাকের বড় বাজার। মেটিয়াবুরুজ থেকে হাওড়া হাট মাত্র ২৫ কিলোমিটার, কিন্তু যেতে আসতে একটা গোটা দিন চলে যায়। রাস্তা ভাল হলে এক জন ব্যবসায়ী এক বেলার মধ্যে যাতায়াত সেরে নিতে পারতেন, পুরো দিনটা ব্যবসার জায়গায় অনুপস্থিত থাকতে হত না।

আর এক সমস্যা বিদ্যুৎ নিয়ে। শিল্পসংস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিকঠাক রাখতে সরকার যে ব্যবস্থা করেছে, ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা সচরাচর তার নাগাল পান না। এটা বিশেষ করে তাঁদের পক্ষেই বড় বেশি সমস্যার ব্যাপার, কারণ নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন, এত টাকা তাঁদের নেই।

তৃতীয় সমস্যা, অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ। দুর্নীতিগ্রস্ত কারখানা-ইনস্পেক্টরদের সহজ শিকার এই ক্ষুদ্র উদ্যোগীরাই। তাঁদের অল্প লাভ রেখে ব্যবসা চালাতে হয়, তাই ইনস্পেক্টরদের ঘুস দিতে হলে লাভের কড়িতে বেশ কিছুটা টান পড়ে। কষ্টার্জিত টাকায় একটা ছোট মেশিন কিনতে না কিনতেই ইনস্পেক্টর এসে ঘুস চাইবেন এবং ঘুস না পেলে কারখানা বন্ধ করে দেবেন— এই ভয়ে অনেকে আদৌ বিনিয়োগই করতে চান না। নিয়ন্ত্রণের বাড়াবাড়ি এবং অপব্যবহারের আর একটা ফল হয় এই যে, ভয়ে অনেকে ছোটখাটো শিল্পসংস্থার রেজিস্ট্রেশনই করান না, অথচ রেজিস্ট্রেশন না থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ মেলে না, বিদ্যুৎ বা সরকারি ভাবে সরবরাহ করা অন্য কোনও উপকরণই যথাযথ উপায়ে পাওয়া যায় না।

সব নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়াটা সমাধানের পথ নয়। প্রত্যেক ধরনের শিল্পের জন্য চাই খুব স্পষ্ট, বাস্তবোচিত এবং সহজ সরল নির্দেশাবলি। যেমন—আপনি যদি এই ধরনের মেশিন কিনে থাকেন এবং এই কয়েকটি কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, ইনস্পেক্টর আপনাকে বিরক্ত করতে পারবেন না। এর পাশাপাশি, দুর্নীতিগ্রস্ত ইনস্পেক্টরদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানো দরকার, দরকার 'অভিযোগ বিভাগ' তৈরি করা, যেখানে অভিযোগ দাখিল করা যায় এবং করলে কাজ হয়।

পরিকাঠামোর ঘাটতি এবং ঘুসের প্রাদুর্ভাব ছাড়াও সমস্যা আছে। যথা, দক্ষ এবং আধা-দক্ষ কর্মীর অনটন; প্রযুক্তি এবং বিপণনের ব্যাপারে সহযোগিতার অভাব; সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে ঋণ পাওয়ার সমস্যা। প্রত্যেকটি ঘাটতি পূরণ করতে সরকার সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। যে সব শিল্পে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে না সেখানেও ন্যূনতম একটা দক্ষতা লাগে, এবং সেই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাটুকু না থাকলে চলে না।

এই কারণেই বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করা বিশেষ জরুরি। পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের যে সব আয়োজন আগে হয়েছে তার অভিজ্ঞতা ভাল-মন্দ মিশিয়েই। অন্তত খবরের কাগজ পড়ে তা-ই মনে হয়। বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সফল প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষকের অভাবে এবং অচল পাঠ্যসূচির ফেরে পড়ে অনেক উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। সমস্যা সমাধানের একটা উপায় হল চালু শিল্পসংস্থায় শিক্ষানবিশির জন্য ভর্তুকি দেওয়া। বেকার যুবকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থে চালিত নানা যোজনা আছে, তার টাকা এই কাজে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি ও বিপণনের ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করাও অত্যন্ত জরুরি। নতুন ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য এমন পণ্য

এর পর চারের পাতায়

প্রতিযোগিতা যত বাড়বে

প্রথম পাতার পর

নির্দিষ্ট করা দরকার, রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে যার নিজস্ব বাজার আছে। ছোট শহরের সামর্থ্যের এক জন সাধারণ উদ্যোগীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিজের জোরে এ কাজ করে ফেলা কঠিন। তাঁর দরকার এমন দিশারীর, যিনি বা যাঁরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় খবরাখবর রাখেন এবং যাঁর বা যাঁদের ভাল যোগাযোগ আছে। চিনের শিল্পায়নে প্রভূত সাহায্য করেছেন হংকং এবং তাইওয়ানের চিনা বংশোদ্ভূত বিনিয়োগকারীরা। তাঁরা কেবল পুঁজি ও কারিগরি বিদ্যাই সরবরাহ করেননি, উৎপাদন কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক বাজারের যোগসূত্র রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কোরিয়ার শিল্পোন্নয়নে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে সে দেশের ট্রেডিং হাউসগুলি। পশ্চিমবঙ্গের তাই এক ঝাঁক তৎপর উদ্যোগীকে আকর্ষণ করা এবং তৈরি করা প্রয়োজন, দেশের এবং বিদেশের বাজারে যাঁদের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে, যাতে সেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে তাঁরা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের— চুক্তির ভিত্তিতে— সাহায্য করতে পারেন। সরকারের উচিত ট্রেডিং হাউস এবং উদ্যোগীদের নেটওয়ার্ক তৈরির কাজটাকে এগিয়ে দেওয়া, তাঁদের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর সরবরাহ করা, দরকার মতো তাঁদের সাহায্য করা। রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে শিল্পবাণিজ্য প্রদর্শনী বা মেলার আয়োজন করাও দরকার, যাতে রাজ্যের ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। তাঁদের ইন্টারনেট এবং ই-কমার্স বা ইন্টারনেট মারফত বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়াও জরুরি।

সব শেষে বলা দরকার ঋণের কথা। ছোট এবং নতুন ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধহয় ঋণ নিয়েই। সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সংগঠিত অর্থ লগ্নি সংস্থা যে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তার বেশির ভাগটাই এই রাজ্যে লগ্নি হয় না। ছোটখাটো উদ্যোগীরা এই সব সংস্থার নাগালই পায় না। যেমন, মেটিয়াবুরুজের পোশাক শিল্পে অধিকাংশ ব্যবসায়ীরই ব্যাঙ্ক বা বড় কোনও অর্থ লগ্নি সংস্থার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই। এর একটা কারণ হল, কলকাতায় যে ব্যাঙ্কগুলির উদ্ভব তারা, বিশেষত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এখন 'দুর্বল ব্যাঙ্ক'-এ পরিণত হয়েছে, তাই নতুন ঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে তারা অতিসতর্ক। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধহয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের ঋণগ্রাহকদের সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের পরিচালকরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন। সুদীপ চৌধুরী এবং অনিন্দ্য সেন কৃত পূর্বোক্ত রিপোর্টে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে সরকার এবং/অথবা কোনও নামজাদা উপদেষ্টা কম্পানি একটি সংস্থার ব্যাঙ্কঋণ পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়নি। এটা পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্কগুলির গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতারই পরিণাম। বার বার দেখা গেছে, বিনিয়োগকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়েছেন, তার পরে নিজেদের সংস্থার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন এবং বহু টাকা আত্মসাৎ করে এক সময় লকআউট ঘোষণা করে দিয়েছেন। অধিকাংশ বিনিয়োগকারী নিশ্চয়ই এমন অসৎ নন, কিন্তু অল্প কিছু লোকের অপরাধের মাসুল গুনতে হয় অন্যদের।

গোটা ব্যবস্থাটিকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে হলে কয়েকটি কাজ করে ফেলা দরকার। প্রথমত, রাজ্য সরকারের উচিত কলকাতা-ভিত্তিক ব্যাঙ্কগুলিকে চাঙ্গা করার জন্য কেন্দ্রকে চাপ দেওয়া। চাঙ্গা করার উপায় কী? বেসরকারিকরণের সম্ভাবনা কম, শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসার সম্ভাবনা, তা ছাড়া ভদ্রস্থ দাম দিয়ে এই ব্যাঙ্কগুলি কেউ কিনবেন বলে মনে হয় না। তাই এক একটি দুর্বল ব্যাঙ্ককে অন্য কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে তারা পশ্চিমবঙ্গে ঋণের অনুপাত বাড়ায়। ঋণের একটি অংশ স্বাভাবিক ভাবে অনাদায়ী থাকবে ধরে নিয়ে সে জন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়ে রাখলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা আরও সাহসের সঙ্গে ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন। অনাদায়ের মাত্রা কমানোর জন্য নতুন ধরনের ঋণ প্রকল্প রূপায়ণ করা যায়, যেমন 'মাইক্রো ক্রেডিট' বা অতি-ক্ষুদ্র ঋণ, যে ঋণ কোনও এক জনকে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে কয়েক জনের একটি গোষ্ঠীকে; ঋণশোধের দায় ব্যক্তির নয়, গোষ্ঠীর, অর্থাৎ ঋণ অনাদায়ী থাকলে গোষ্ঠীর কেউই আর ঋণ পাবেন না, ফলে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের ঋণ শোধের জন্য তাগিদ থাকবে অন্য সদস্যদের। এ ছাড়া, চালু করা যেতে পারে ভ্রাম্যমাণ (মোবাইল) ব্যাঙ্কিং, যার সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে কৃষিনির্ভর উদ্যোগীদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কের সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়।

পাশাপাশি, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান বাড়ানো দরকার। যেমন ধরুন, আপনি অতীতে একটি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। আপনি সেই ঋণ সময়মতো শোধ করেছেন কি না, না করলে কেন করেননি, প্রকৃত কোনও সমস্যা ছিল না ইচ্ছে করে ফাঁকি দিয়েছেন, সেই সব তথ্য ওই ব্যাঙ্কটির হাতে আছে। এ বার, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হাতে থাকা এই ধরনের যাবতীয় তথ্য যদি একটি নেটওয়ার্কে রাখা হয়, তা হলে যে কোনও ব্যাঙ্ক তা কাজে লাগাতে পারবে, সে ক্ষেত্রে আপনি অন্য একটি ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চাইলে সেই ব্যাঙ্ক প্রথমেই যাচাই করে নিতে পারবে, ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি নির্ভরযোগ্য কি না। এতে যেমন ব্যাঙ্কের সুবিধা হবে, গ্রহীতাদের ঋণ শোধ দেওয়ার তাগিদও বাড়বে।

তৃতীয়ত, রাজ্য সরকারের উচিত কিছু বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা, যাদের কাজ হবে শিল্পবাণিজ্যের জন্য প্রদত্ত ব্যাঙ্কঋণ অনাদায় সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা। এমন অগণিত মামলা জমে আছে। যারা ইচ্ছে করে ঋণ শোধ করে না, ফেলে রাখে, এই ট্রাইবুনালগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার অধিকার দিতে হবে।

চতুর্থত, অনেক শিল্পসংস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রাপ্য টাকা মেটায় না, সরকারি সংস্থার কাছে উপকরণ কিনে সময়মতো দাম চুকিয়ে দেয় না। এই অনাচার বন্ধ করতে রাজ্য সরকারকে তৎপর হতে হবে। চৌধুরী-সেন রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, অনেক সংস্থা দীর্ঘ দিন ধরে বিদ্যুৎ পর্ষদের দাম মেটায়নি, শেষ পর্যন্ত তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে এবং সেটাই কম্পানি লাটে ওঠার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই গোড়ায় চাপ দিলে বিল আদায় হত, কিন্তু বকেয়া জমতে জমতে এমন দাঁড়িয়েছে যে এখন আর তা মিটিয়ে দেওয়ার কোনও তাগিদ নেই। বিল আদায়ের কাজে বিদ্যুৎ পর্ষদের অনেক বেশি কঠোর এবং তৎপর হওয়া দরকার। যেমন, কারও যদি অতীতে বিদ্যুতের বিল মেটানোর ব্যাপারে দুর্নাম থাকে, তা হলে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনও কম্পানিকে পর্ষদ যেন 'কালো তালিকা'য় চিহ্নিত করে দিতে পারে। তাতে বিল না মেটানোর প্রকোপ কমবে।

সংক্ষেপে বললে, ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চাই বহুমুখী উদ্যোগ। ছোট ছোট উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান নিয়ে নানা সমস্যা আছে, সমস্যা আছে পরিবেশ-পরিকাঠামো নিয়েও। পরিকাঠামো, ঋণ, প্রযুক্তি, বিপণন— একযোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে না পারলে কাজের কাজ হবে না। অতীতে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মূলত সংরক্ষণের নীতি অনুসৃত হয়েছে, অর্থাৎ সরকার বহু পণ্যকে কেবল ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছে, বৃহৎ শিল্পসংস্থা সে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। এই নীতির গোড়ায় গলদ। কোনও একটি শিল্পের পক্ষে কোনটি সেরা প্রযুক্তি, কী পরিমাণে উৎপাদন করলে উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক হয়, সে সব কথা সরকারের পক্ষে জানা, বিশেষত আগে থেকে জানা, অত্যন্ত কঠিন।

তা ছাড়া, যে সংস্থা সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করে তাকে (বৃহৎ শিল্পের) প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হয় না। অথচ, প্রতিযোগিতা না থাকলে খরচ কমানোর তাগিদ থাকে না, বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার উৎসাহও থাকে না। সংরক্ষণ নয়, বরং প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া জরুরি; প্রতিটি শিল্পে যত বেশি উদ্যোগী প্রবেশ করবেন, প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, ততই মঙ্গল।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক এবং বাস্তবোচিত শিল্পায়নের জন্য কী কী করণীয়, সে বিষয়ে আমরা একটি সামগ্রিক প্রস্তাবের রূপরেখা পেশ করলাম। এই প্রস্তাবের মূলে আছে তিনটি বিষয়, যেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। এই তিনটি বিষয় হল: (১) পরিকাঠামো, (২) শিক্ষা এবং (৩) ক্ষুদ্র শিল্পকে সহযোগিতা, যে শিল্পে সাধারণের ব্যবহার্য নানা পণ্য উৎপাদন করা হবে। সর্বোপরি, কয়েক জন সফল উদ্যোগীকে বেছে নিয়ে এবং কয়েকটি বিশেষ শিল্পের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে কেবল তাদেরই বিপুল ভর্তুকি দিয়ে সাহায্য করলে ভুল হবে। এমন একটা নীতির অনেক বিপদ আছে। প্রথমত, সাফল্য অনিশ্চিত; অল্প কিছু শিল্প বা উদ্যোগীর উপর নির্ভর করলে, তারা যদি ব্যর্থ হয় তবে সবই গেল। দ্বিতীয়ত, এই পথে চললে শিল্পের ভিত্তি সংকীর্ণ থেকে যাবে। তৃতীয়ত, ভর্তুকির বোঝা সরকারি কোষাগারের পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে। চতুর্থত, কিছু স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে সমস্ত সুযোগসুবিধা কুক্ষিগত করতে তৎপর হবে। সরকারের বরং লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি পরিব্যাপ্ত শিল্পকাঠামো তৈরি করা, যেখানে অনেক ধরনের পণ্য ও পরিষেবা উৎপন্ন হয়। চিনে এবং পূর্ব এশিয়ার শিল্পসফল দেশগুলিতে এমনটাই ঘটেছে। এটা সম্ভব করতে হলে এক দিকে সরকারকে শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দিতে হবে, অন্য দিকে সব ব্যাপারে অহেতুক নাক গলানোর অভ্যাস পরিত্যাগ করে ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য স্বাধীনতা দেওয়া চাই। প্রশাসনের চরিত্র এই ভাবে বদলে দেওয়া সহজ কাজ নয়, সে জন্য অনেক বিষয়েই নতুন ভাবনাচিন্তা দরকার। এ বিষয়ে আমরা পরে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করব। কৃষি এবং জন-পরিষেবার ক্ষেত্রে কী করণীয়, সে সম্পর্কেও বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

আপাতত, কি শিল্পবাণিজ্যে, কি চিন্তাভাবনায়, শত পুষ্প বিকশিত হতে থাকুক। *(শেষ)*

ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা। *মেটিয়াবুরুজের পোশাক শিল্প। যথেষ্ট সুযোগ পেলে ওঁরা যে কোনও বাজারে প্রতিযোগীদের মহড়া নিতে পারেন না কি?*

এক নজরে

ব্যাধির লক্ষণ
- শিল্পবাণিজ্যে পিছনের সারিতে
- কর্মসংস্থানে ভাটার টান
- বৈদেশিক বাণিজ্যে অকিঞ্চিৎকর
- লকআউটের পরে লকআউট
- কলকাতা থেকে মেধার পলায়ন

ব্যাধির কারণ
- শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম
- পরিকাঠামো
- পদে পদে সরকারি নিয়ন্ত্রণ
- দক্ষতার অভাব

চিকিৎসার উপায়

(১) পরিকাঠামো
ভাল রাস্তা, নিশ্চিত বিদ্যুৎ ইত্যাদি

(২) শিক্ষা
রাজনীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি
বেসরকারি উদ্যোগে স্কুলকলেজ
শিল্পবাণিজ্যের সঙ্গে আদানপ্রদান

(৩) শিল্পায়ন
বহু ক্ষুদ্র শিল্প চাই
সরকারি নিয়ন্ত্রণ লাঘব করা চাই
ঋণ চাই, ঋণ
সংরক্ষণ নয়, চাই প্রতিযোগিতা

শেষ কথা: শত পুষ্প বিকশিত হোক

গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি